৬

ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

তানিম হোসাইন শাওন ও এটিএম মোরশেদ আলম

এই অধ্যায়ে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার, বিশেষ করে আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত আদালতের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য বিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১] তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ, বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ, আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার প্রশ্নে ক্ষতিগ্রস্তের প্রত্যাশার আলোকে এই অধিকারগুলোকে পরীক্ষা করা হয়েছে।

দেশে প্রচলিত ফৌজদারি আইনের অধীনে ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির অধিকার এ বছর খুব সামান্যই সুরক্ষিত হয়েছে। যদিও নির্বাহী বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা হয়েছে, কিন্তু এ বছর বেশ কিছু মামলার বিচার প্রক্রিয়া থেকে এই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে যে, সাধারণ জনগণের জন্য এই পৃথক্করণ কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনেনি। তাছাড়া জনগুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোতে সরকারের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ বিচার প্রক্রিয়া এবং বিচার ব্যবস্থার অখণ্ডতা সম্পর্কে মানুষের আস্থাকে নিম্নমুখী করেছে। দুর্নীতির মামলাসহ জরুরি বিধিতে পরিচালিত মামলায় প্রদত্ত রায় ও আদেশে ধারাবাহিকতার অভাব জনমনে নানা প্রশ্ন তৈরি করেছে। এসব ক্ষেত্রে আইন উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

---

১ বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ।

জামিন নামঞ্জুর, মঞ্জুর

যদিও নীতিগতভাবে জামিনের বিষয়টি ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এখানে আলোচনার কারণ ফৌজদারি মামলার বিচার পদ্ধতি এবং স্বচ্ছতা প্রশ্নে জনগণের প্রত্যাশা অনেকটাই জামিনের সাথে সম্পর্কিত।

২০০৭ সালে হাইকোর্টের একটি রায়ে ঘোষণা করা হয়, জরুরি ক্ষমতা বিধিমালাতে মামলা হয়েছে এই কারণে হাইকোর্টের জামিন প্রদানের এখতিয়ার খর্ব হবে না। *রাষ্ট্র বনাম মায়েজ উদ্দীন শিকদার*[2] মামলায় আপিল বিভাগ হাইকোর্টের এই রায় বাতিল করে দেয়। তবে আপিল বিভাগ কয়েকটি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের জামিন প্রদানের এখতিয়ার বহাল রাখে। যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মামলা দায়ের করা না হয় অথবা উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা না হয় (*কোরাম নন-জুডিস*[3]) অথবা মামলার বিচারকালে যদি দেখা যায় মামলাটি অসৎ উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জরুরি বিধিমালার ১৬(২) ধারার আওতায় শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাহলে ঐ মামলা ১৯ঘ বিধির অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং এরূপ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট জামিন দিতে পারবে।

জরুরি বিধিমালা জামিনের ক্ষেত্রে যে অতিকঠোর বিধান করেছে, আপিল বিভাগের এই রায় হয়তো সেই বিধানকে কিছুটা নমনীয় করেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রায়ের মাধ্যমে জামিন প্রদানের বিধান কোনোভাবেই পরিষ্কার হয়নি। আপিল বিভাগের রায় পড়লে সোজাসাপ্টাভাবে ধারণা হয় যে, এই রায়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত শুনানি না হওয়া পর্যন্ত কোনো মামলায় হাইকোর্টকে জামিন প্রদান হতে বিরত রাখা হয়েছে। এর ফলে কোনো ব্যক্তির কারাভোগের মেয়াদ অন্যায়ভাবে দীর্ঘায়িত হবে।

আপিল বিভাগের ঐ রায়কে পরিষ্কার ও আরো বিস্তারিত করার একটি আবেদন দাখিল করা হলেও তা শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়নি।[4] কিন্তু ইতোমধ্যে হাইকোর্টের দু'একটি বেঞ্চ জরুরি বিধিমালায় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের নজিরবিহীনভাবে জামিন দিতে শুরু করে। পত্রিকা মতে, ১৪ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ

---

২ ২৮ ডিএলআর (আপিল বিভাগ) (২০০৮) ১৩৫।

৩ কোনো মামলাকে তখনই *কোরাম নন-জুডিস* বলা হবে যখন তা এমন আদালতে দায়ের করা হয় যে আদালতের ঐ বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো এখতিয়ার নেই অথবা ঐ আদালত আইন সঙ্গতভাবে গঠিত হয়নি।

৪ অ্যাডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান ২৮ মে ২০০৮ আপিল বিভাগের রায়কে বিশ্লেষণ এবং পু-নর্বিবেচনার একটি আবেদন দাখিল করে।

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ৭৬ জনকে জামিন দেয়।[৫] ঐ একই বেঞ্চ প্রতি মামলায় মাত্র ৬৩ সেকেন্ড করে সময় নিয়ে একদিনে মোট ২৯৮ মামলায় আদেশ প্রদান করে।[৬] অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এসব জামিন আবেদনের বিরোধিতাও করেনি, যা স্পষ্টভাবে এই সঙ্কেত বহন করে যে, এসব মামলায় কোনো কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছে। পত্রিকায় ব্যাপকভাবে এরূপ একটি সংবাদও প্রকাশিত হয় যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং তার পুত্র তারেক রহমানকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক সমঝোতার কারণে।[৭]

আপিল বিভাগের নিজের সিদ্ধান্ত অধস্তন আদালত কর্তৃক এভাবে অমান্য করা হলেও আপিল বিভাগকে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। যদিও জামিনে মুক্তি পাওয়া ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির অধিকারকে সুগম করে কিন্তু জামিন সংক্রান্ত জরুরি বিধিমালার এরূপ অস্পষ্টতা দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের জন্য শুভকর নয়। প্রথমে জামিন না দেয়ার কঠোর নীতি এবং পরবর্তীকালে ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের জামিনে মুক্তি, আবার অন্যদিকে বিচারাধীন সাধারণ বন্দিদের ক্ষেত্রে সরকারের ভিন্ন মনোভাবের ফলে পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার নিয়েই জনগণের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্তদের জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিকে অন্যান্য সাধারণ বন্দিদের আলোকে বিবেচনা করতে হবে। দেশের কারাগারগুলোতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর বন্দি অবস্থায় আছে, তারা সংশ্লিষ্ট আদালত থেকে জামিনও পাচ্ছে না আবার উচ্চতর কোনো আদালত থেকে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকারও পাচ্ছে না।

কেসস্টাডি : ‘অতিশাব্দিক মুক্তি’ [সুপারসনিক রিলিজ]

---

৫ ‘দুর্নীতির মামলায় এক বেঞ্চেই এক মাসে ৭৬ জনকে জামিন’, *প্রথম আলো,* ২০ আগস্ট ২০০৮।

৬ ‘৩১৫ মিনিটে ২৯৮ মামলায় আদেশ’, *প্রথম আলো,* ৯ নভেম্বর ২০০৮।

৭ দুর্নীতির মামলার অভিযুক্ত খালেদা জিয়া এবং তার পুত্র তারেক রহমান নাটকীয়ভাবে যথাক্রমে ৯ সেপ্টেম্বর এবং ৩ সেপ্টেম্বর জামিনে মুক্তি লাভ করেন। পত্রিকার খবর মতে, খালেদা জিয়া তখনই সরকারের সাথে আলোচনা করতে রাজি হন যখন তার পুত্র তারেক রহমানকে জামিন দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। দেখুন : ‘তারেক ফ্রিড অন বেল : মে গো এবরোড ফর ট্রিটমেন্ট’, *দি ডেইলি স্টার;* ‘তারেক রিলিজ অন বেল’, *নিউএজ,* ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার ঠিক একদিন পর জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী[৮] কারাগার থেকে মুক্তি পান। যদিও সাতজন রাজনীতিবিদ হাইকোর্টের ঐ একই বেঞ্চ থেকে ১৪ জুলাই ২০০৮ জামিন পান কিন্তু একমাত্র নিজামীই পরের দিন মুক্তি পান।[৯]

প্রিজন ভ্যানের মধ্যে নিজামী

এটা রায় দ্রুত কার্যকর হওয়ার একটা ইতিবাচক উদাহরণ হতে পারত, যদি সাধারণ বন্দিদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটত। সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিচারকের স্বাক্ষরিত আদেশের কপি পেতে হাইকোর্টে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে এবং বর্তমান মামলা হলো তেমনই একটি ব্যতিক্রম যা শুধু নিজামীর ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কিন্তু সাধারণ বন্দিদের ক্ষেত্রে আদালত থেকে প্রতিকার পাওয়ার পরও এই প্রতিকারের সুফল পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

নির্বাহী আদেশে মুক্তি

কমপক্ষে তিনটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরকার আইনি পদ্ধতিকে পাস কাটিয়ে মুক্তি দিয়েছে। জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন, এই যুক্তিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার

৮ ১৯৭১ সালে গণহত্যা এবং অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ সংঘটনকারী আলবদর বাহিনীর কমান্ডার ছিল মতিউর রহমান নিজামী।

9 ÔwbRvgxi `"Z Rwg‡b gyw³ †hfv‡eÕ, *c_g Av‡jv*, 18 RyjvB 2008|

ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো এবং আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল জলিলকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেয়া হয় এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। নির্বাহী আদেশে এরূপ মুক্তির আগে পত্রিকায় একাধিক খবর প্রকাশিত হয় যে, সরকারের সাথে আলোচনায় বসার জন্য আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে রাজনৈতিক দরকষাকষি করেই এদের মুক্তি দেয়া হচ্ছে।[১০] এই অনুমান আরো জোরদার হয় যখন বাণিজ্য উপদেষ্টা ঘোষণা দেন যে, এসব ব্যক্তির জামিনে মুক্তি দেয়া হবে, আদালত যাই সিদ্ধান্ত দিক।

এখন প্রশ্ন হলো– সরকার এসব লোককে কি সত্যিই রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য আটক করেছিল নাকি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য? পরে অবশ্য সরকারই উল্টো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বিচার ব্যবস্থাকে পাস কাটিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে। নির্বাহী আদেশে এরূপ মুক্তি নিয়ে কিন্তু হাইকোর্টে প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে।[১১]

অভিযোগ প্রত্যাহার

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি এবং তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একটি– কমপক্ষে এই চারটি দুর্নীতি মামলায় বাদি হঠাৎ পিছু হটেছে। একটি ছাড়া বাকি তিনটি মামলাতেই পুলিশ শুধু অভিযোগগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে, আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মামলা প্রত্যাহারেরও প্রয়োজন মনে করেনি। ব্যবসায়ী আজম জাহাঙ্গীর চৌধুরী স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে আবেদন করে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি চান। কারণ হাসিনার বিরুদ্ধে সরাসরি তার কোনো অভিযোগ নেই।[১২] কাজী তাজুল ইসলাম ফারুক একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিন কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা প্রত্যাহার করেন।[১৩] অন্য একজন ব্যবসায়ী

---

১০ 'প্যারোলে মুক্তি পেলেন জলিল', *ইনকিলাব*, ৩ মার্চ ২০০৮; 'খালেদা ওয়ান্টস টু টক রিজলভ ক্রাইসিস', *নিউএজ*, ১০ জুলাই ২০০৮।

১১ শেখ হাসিনার দাখিল করা একটি জামিন আবেদন শুনানির সময় হাইকোর্ট বিদেশে চিকিৎসার জন্য নির্বাহী আদেশে মুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। 'গভ. আস্কড নট টু হ্যারাস হাসিনা টিল অক্টো ২০', *নিউএজ*, ৬ অক্টোবর ২০০৮।

১২ 'আজম চৌধুরী অ্যাপ্লাইজ টু উইথড্র কেস এগেনেস্ট হাসিনা', *নিউ নেশন*, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮। এই সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে তিনি মামলা করেছিলেন বিপরীত পরিস্থিতিতে ভুলক্রমে।

১৩ 'তাজুল অ্যাপিলস টু লিফ্ট এক্সটরশন কেস এগেনেস্ট হাসিনা', *নিউ নেশন*, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮।

নূর আলী বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার চাপে তিনি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১৪] পুলিশ অবশ্য আগেই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে এই মামলা বাতিল করে দেয়। পরে নূর আলী একটি শোভাযাত্রায় আনুষ্ঠানিকভাবে হাসিনার কাছে ক্ষমাও চান।[১৫] একইভাবে আমিন আহাম্মেদ ভুঁইয়া তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন। তার বক্তব্য, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এই মামলা করতে বাধ্য করা হয়েছিল।[১৬] এধরনের ঘটনা সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে যার ভিত্তিতে ক্ষমতাচ্যুত অনেক রাজনৈতিক নেতাকে আটক ও গ্রেফতার করা হয়, সন্দেহযুক্ত করে। প্রশ্ন হলো, মামলার বাদিরা কি রাজনৈতিক আবহাওয়া বদলের সাথে সাথে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেছে, নাকি তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতের পুতুল ছিল? প্রতিটি ক্ষেত্রেই এসব মামলার স্বচ্ছতাকে খোলসের মধ্যে রাখা হয়েছিল।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মামলা

পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন অনেক মামলা স্থগিত করে সুপ্রিম কোর্ট।[১৭] ৩১ জুলাই ২০০৮ দুদক কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশেষ আদালতগুলোতে বিচারাধীন ছিল ১০০টি মামলা। এর মধ্যে হাইকোর্টের আদেশে ৫০টি মামলা বা এর তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।[১৮] এই পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্ট কর্তৃক অন্য আরো অনেক মামলা স্থগিত করা হয়।

বেশিরভাগ মামলার ক্ষেত্রেই হাইকোর্ট দুর্নীতি দমন কমিশনকে ব্যাখ্যা করতে বলছে যে, এই মামলাগুলো দায়ের করা থেকে শুরু করে তদন্ত কার্যক্রম পর্যন্ত আইনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। যদিও নিম্ন আদালতের মামলা বাতিল করে হাইকোর্টের এরূপ আদেশ এখনো চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষায় আছে, কিন্তু এসব আদেশের গতিধারা থেকে হাইকোর্টের

---

১৪ 'আই ওয়াজ কোয়ারস ইনটু সুইং হাসিনা : নূর আলী', *নফহবং২৪.পড়স*, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

১৫ 'নূর আলী অ্যাপোলোজাইজেস অ্যাট হাসিনা র‍্যালি', *নফহবং২৪.পড়স*, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

১৬ 'প্লেইনটিপ ওয়ান্টস টু ড্রপ কেস এগেনেস্ট তারেক', *দি ডেইলি স্টার*, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮।

১৭ ২০04 সালে ফৌজদারি কার্যবিধিতে সংশোধনী এনে ২ মে ২০০৭ সারা দেশে ১৮টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন এমপি হোস্টেলে স্থাপন করা হয় পাঁচটি ট্রাইব্যুনাল। দেখুন : *ইনকিলাব*, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৮ 'অধিকাংশ দুর্নীতি মামলা স্থগিত : গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল', *ইনকিলাব*, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই অনুমান করা যায়। যদি পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে এসব মামলা চূড়ান্তভাবে বাতিল হয়ে যায়, তখন প্রশ্ন উঠবে– বাতিল হওয়া মামলাগুলোতে যে অভিযোগ ছিল সরকার কীভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, নাকি আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেবে না?

সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অধ্যাদেশ, ২০০৮-এর বিধান অনুসারে ৩ আগস্ট গঠিত হয় 'সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন'। এই আইন অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি তার অপ্রদর্শিত আয় কমিশনে জমা দিয়ে অনুকম্পা চায় তাহলে শাস্তি মাফ পেতে পারে। তথ্য প্রকাশের এরূপ অধিকারের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ২ জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত। নভেম্বর পর্যন্ত ৩৮৯ জন, যার বেশিরভাগই সরকারি কর্মকর্তা ও মাঝারি গোছের ব্যবসায়ী, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের আবেদন করে। এদের মধ্যে ২৫৯ জন ২৭.৭৯ কোটি টাকা মূল্যমানের অপ্রদর্শিত সম্পত্তি নিজেদের দখলে রাখার কথা স্বীকার করে। তারা সরকারের রাজস্ব অফিসে এজন্য ১৪.৪৬ কোটি টাকা জমাও দেয়।[১৯]

১৩ নভেম্বর ২০০৮ একটি জনস্বার্থ রিট মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অধ্যাদেশ, তথ্য ও জবাবদিহিতা কমিশন গঠন এবং এর সমস্ত কার্যাবলিকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।[২০] আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে বিচারের সম্মুখীন না করেই এই আইনে যেহেতু অপরাধীকে মুক্তি প্রদানের সুযোগ আছে, তাই সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন আইন-বহির্ভূত ও অবৈধ।[২১] রিট মামলার আইনজীবীরা যুক্তি দেখান, এই আইনের মাধ্যমে কমিশনকে গোপন শুনানির ক্ষমতা দেয়া, সম্পত্তির হিসাবের ক্ষেত্রে শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করা ইত্যাদি বিধান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। ১৬ নভেম্বর আপিল বিভাগ এক মাসের জন্য হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে এই সময়ের মধ্যে

---

১৯ আশুতোষ সরকার, 'জুডিশিয়াল পাওয়ারস অব ট্যাক লেড টু ভারডিক্ট এগেনেস্ট ইট', *দি ডেইলি স্টার*, ১৫ নভেম্বর ২০০৮।

২০ মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের আদিলুর রহমান খান ও এএসএম নাসির উদ্দিন এলান, উবিনীগ-এর নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার এবং রাজনৈতিক নেত্রী ডা. দীপু মনি জনস্বার্থে এই মামলা দায়ের করেন।

২১ 'ট্রুথ কমিশন নট লিগ্যাল', *দি ডেইলি স্টার*, ১৪ নভেম্বর ২০০৮।

কমিশনকে এর কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয়।[২২] যা হোক, কমিশন হাইকোর্টের আদেশ প্রদানের পূর্বেই এর সব শুনানি শেষ করে ফেলেছিল এবং আদেশ প্রদানের পর শুধু প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় নতুন অভিযোগ

২৯ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ সাবেক বিএনপি সরকারের মন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু এবং ২১ জন হরকাতুল জিহাদ সদস্যের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার দায়ে অভিযোগ গঠন করে।[২৩] মামলার বিচার শুরু হয় ১৭ নভেম্বর ২০০৮। সাবেক বিএনপি সরকারের শেষ দুই বছরে এই মামলার কোনো অগ্রগতি না হওয়ার কারণে দু'জন নির্দোষ ব্যক্তি জজ মিয়া এবং শৈবাল সাহা পার্থকে বলির পাঁঠা হতে হয়। তাদের এই মামলায় গ্রেফতার করা হয় এবং নির্দয় আচরণ করা হয়।[২৪] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মামলার তদন্ত নতুন করে শুরু হয় এবং নিষিদ্ধ ইসলামি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান এই হামলাসহ আরো গ্রেনেড ও বোমা হামলায় নিজে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।[২৫]

২১ আগস্ট মামলার অভিযোগপত্র এবং হামলার পর আপিল বিভাগের বিচারপতি জয়নুল আবেদীনের সমন্বয়ে গঠিত এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কমিশনের প্রতিবেদনে কোনো কারণ উল্লেখ না করেই বলা হয়, 'এই হামলার পেছনে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা দায়ী, ...তারা এই দেশকে তাদের অধীনস্থ রাষ্ট্র বানাতে ইচ্ছুক। ...অতীতের অন্যান্য হামলার মতো এই হামলাও চালানো হয়েছিল এই আশায় যে, এর দ্বারা পশ্চিমা বিশ্বসহ সবার সহমর্মিতা ও সহযেগিতা পাওয়া যাবে। কারণ আওয়ামী লীগ নিজেকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি করে।' [২৬]

---

২২ আরো দেখুন : *প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন* বিষয়ক অধ্যায় ২।

২৩ 'আগস্ট ২১ কেস গোজ টু ট্রায়াল', *দি ডেইলি স্টার*, ৩০ অক্টোবর ২০০৮।

২৪ জজ মিয়াকে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০০৫ সালের জুন মাসে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যান্য আসামির নাম উল্লেখপূর্বক তাকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়। দেখুন : *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ*, আসক, *২০০৭*, পৃ. ২৬।

২৫ শহিদুজ্জামান, 'আগস্ট ২১ গ্রেনেড অ্যাটাক : জুডিশিয়াল প্রোব রিপোর্ট শেল্‌ভড', *নিউএজ*, ২১ আগস্ট ২০০৮।

২৬ *প্রাগুক্ত*, গ্রেনেড হামলার পরের দিন বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার এই কামিশন গঠন করে, আওয়ামী লীগ কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

২০০৫ সালের বোমা হামলা মামলায় গণঅব্যাহতি

২০০৫ সালে আদালতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা হামলায় দায়েরকৃত বেশ কিছু মামলার ২০০৮ সালে রায় ঘোষণা করা হয়েছে।[২৭] প্রায় প্রতিটি মামলাতেই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে আসামিরা নির্দোষ খালাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, বরিশালে ১৭ আগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোট ১২টি মামলার মধ্যে আটটি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে, এর মধ্যে সাতটি মামলাতেই সব আসামি খালাস পেয়েছে।[২৮] চট্টগ্রামে একটি মামলায় পুলিশের গাফিলতির কারণে তিন জঙ্গি খালাস পেয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮। মামলার রায়ে দায়িত্বে অবহেলার জন্য মামলার বাদি এসআই এনায়েত উল্লাহ এবং তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালত বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে।[২৯] এসব মামলার রায়ে ফৌজদারি মামলা তদন্তে পুলিশের অদক্ষতা এবং সুষ্ঠু তদারকি ব্যবস্থার অভাবকেই আলোকপাত করা হয়েছে।

জেলহত্যা মামলায় হাইকোর্ট থেকে আসামিরা খালাস

হাইকোর্ট ২৮ আগস্ট[৩০] জেলহত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সাবেক ছয় সেনা কর্মকর্তাকে খালাস দিয়েছে।[৩১] আদালত শুধু পলাতক আসামি রিসালদার (অব.) মসলেউদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। মসলেউদ্দিন ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বলে আদালত মনে করে। কিন্তু দ্রুত ও কার্যকর তদন্ত করতে পুলিশের

---

২৭ ১৭ আগস্ট ২০০৫ সারা দেশের আদালতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিরিজ বোমা হামলা চালানো হয়। বোমা হামলা চালানো প্রতিটি স্থানে জেএমবি কর্তৃক বিলিকৃত লিফলেটও পাওয়া যায়। এই লিফলেটে জেএমবি স্বীকার করে যে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা এই হামলা চালিয়েছে। তারা প্রচলিত এই আদালত ব্যবস্থাকে স্বীকার করে না।

২৮ '১৭ আগস্ট বোমা হামলা : বরিশালে আরেকটি মামলার রায়, সব আসামি খালাস', *প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৯ 'বোমা বিস্ফোরণ মামলা : চট্টগ্রামে পুলিশের গাফিলতির কারণে ৩ জঙ্গি খালাস; ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ', *ইত্তেফাক*, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৩০ 'এইচ সি ভারডিক্ট ইন জেল কিলিং কেস : মসলেম টু ডাই; ফারুক, শাহরিয়ার, হুদা, মহিউদ্দীন একুইটেড', *দি ডেইলি স্টার*, ২৯ আগস্ট ২০০৮।

৩১ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের নেতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মোঃ মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আড়াই মাস পরে ৪ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়।

ব্যর্থতা সম্পর্কে রায়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। মৃত নেতাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানানো হয়েছে।[৩২]

১৯৭৫ সালে হত্যাকাণ্ডের একদিন পর তৎকালীন সহকারী পুলিশ প্রধান লালবাগ থানায় মসলেউদ্দিনসহ চারজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা[৩৩] হলেও পরবর্তী ২১ বছরে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তী সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে আসামিদের রক্ষা করেছে ও আশ্রয় প্রদান করেছে বলে ব্যাপক অভিযোগও আছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মামলাটি পুনরায় চালু করা হয়। দুই বছর তদন্ত চলার পর ২৩ জন আসামির বিরুদ্ধে ১৫ অক্টোবর ১৯৯৮ অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ঘটনার ২৯ বছর পর মহানগর দায়রা জজ ২০ অক্টোবর ২০০৪ তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে রায় দেন।

হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর আইন বিশেষজ্ঞরা মত দেন যে, এই হত্যাকাণ্ড এবং এতদিন মামলাটিকে দাবিয়ে রাখার পেছনে যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ছিল তা হাইকোর্ট আমলে নেননি। বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা কেমন এবং ক্ষতিগ্রস্তরা কীভাবে বঞ্চিত হয় তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো এই মামলার রায়।

---

৩২ ‘জাতি স্তম্ভিত হতবাক ক্ষুব্ধ’, *জনকণ্ঠ*, ৩০ আগস্ট ২০০৮।

৩৩ ‘এইচ সি ভারডিক্ট ইন জেল কিলিং কেস : মসলেম টু ডাই; ফারুক, শাহরিয়ার, হুদা, মহিউদ্দীন একুইটেড’, *দি ডেইলি স্টার*, ২৯ আগস্ট ২০০৮।